

সম্পাদকীয়

পঞ্জিকা অনুযায়ী এটা আষাঢ় মাস। কিন্তু, ‘হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল’। এখন আর আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বৃষ্টি হওয়া তো দূরে থাক মেঘেরই দেখা মেলে না। এখন সবচেয়েই বিলম্ব। ট্রেন ঠিক সময়ে ছাড়ে না, পরীক্ষা ঠিক সময়ে হয় না, ন্যায়বিচার যথাসময়ে কখনোই পাওয়া যায় না, বরষাও যথারীতি বিলম্বিত।

পত্রিকা প্রকাশে আমাদের কিন্তু কখনো বিলম্ব হয় না। আষাঢ় মাসটা রথযাত্রার জন্য আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমাদের মতো অনেকেই ঈশ্বর বিশ্বাসী নন, তবুও প্রচলিত দেব-দেবীর মধ্যে জগন্নাথের স্বতন্ত্র স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই। তথাকথিত শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণি নির্বিশেষে জগন্নাথ আপামর জনগণের ‘নাথ’! জগন্নাথের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ভারতের প্রথম সংস্কার বিরোধী বিপ্লবী শ্রীচৈতন্য। জাত-পাতের বেড়া ভেঙ্গে, কাজির হুকুম অমান্য করে শ্রীচৈতন্যই প্রথম বিস্কোভ মিছিলের সূচনাকারী। ৫০০ বছর আগে বিপ্লবী পদক্ষেপে তিনি জীবন পরিক্রমা করেছেন। একদিকে পাঠান-শাসন, অভিজাত সামন্ত সম্প্রদায়; অন্যদিকে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ ও স্মৃতি-সংহিতা। আর বাইরে অগণ্য জনসম্মত। এই সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। তিনি রসের মধ্য দিয়ে, ভক্তির মধ্য দিয়ে একটা বিরাট ধর্মোদ্বোধন গড়ে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘...কবীর বল, চৈতন্য বল, সকলেই রসের আঘাতে বাঁধান ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।’ সেই শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম জানিয়ে এবারের সংখ্যা শুরু করলাম।

ঘুরে এলাম নিজামের দেশে

ছায়া মুখোপাধ্যায়

এই তো সেদিনকার কথা। করোনায় বিশ্বস্ত অসহায় মানুষগুলির নীরব আর্তনাদ। চারিদিকে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব সব একে একে চিরবিদায় নিচ্ছে। আর যারা বেঁচে গেলেন, তারা তো এক ভয়ঙ্কর জীবন ধারণের অভিজ্ঞতার শিকার। ঠিক ২০২১ সালের শেষের দিকে লক-ডাউন উঠে গেলেও মানুষজন, অফিস-কাছারি, যানবাহন কোনোটিই তখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসেনি। সেই মুহূর্তে আমাদের অতি নিকট আত্মীয় ফোন করে জানালো যে আমি সবরকম ব্যবস্থা করে তোমাদের কাছে অন-লাইনে টিকিট ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থার প্রতিলিপি ও ছবি পাঠাচ্ছি তোমরা হায়দ্রাবাদ চলে এসো। আমাদেরও তখন খুবই করুণ অবস্থা। আমাদের মনে সংশয় ছিল যথেষ্ট। ওরা তখন সারাদিন আমাদের ফোন করে সমস্ত রকম বিধি ব্যবস্থা জানাতে লাগলো এবং মনে সাহস ও ভরসা যোগালো।

আমরা ৮ জানুয়ারি ২০২২ খুব সকালে নেতাজী বিমান বন্দরে মানুষের সংস্পর্শ ছিন্ন করে পৌঁছে গেলাম। আমাদের হাঁটা-চলার ক্ষমতা ছিল না। তাই ওরা আমাদের জন্য হুইল চেয়ারেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কাজেই আমাদের কোনো অসুবিধাই হয়নি। ফলে আমরা অতি অনায়াসে হায়দ্রাবাদ-এ (রাজীব গান্ধী বিমান বন্দর) পৌঁছে গেলাম। সেখানেও টুলিতে হুইল চেয়ারে পৌঁছে গেলাম বিমান বন্দরের বাইরে। সেখান থেকে ওরা আমাদের গাড়িতে করে সোজা বাড়ি পৌঁছে দিল। ওখানে অবশ্য মাস দুয়েক আগেই বিদায় নিয়েছিল করোনা। সুন্দর ঝাঁ চকচকে শহর। যদিকে তাকাই বড়ো বড়ো রাস্তা, সুউচ্চ প্রাসাদ বাড়িতে দৃশ্যমান। নিজামের দেশ এই হায়দ্রাবাদ। রাজবাড়ির ছোট্টেলে অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালাকে বিয়ে করে মাদুরাইয়ে নিজম প্যালেস ছেড়ে পাহাড়ে ঢালে প্রাসাদ বানিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানেও ঘোড়াশাল, হাতিশাল, একাগাড়ি ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। হায়দার আলি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী, ভ্রমণপিপাসু, শিল্পানুরাগী মানুষ। তাই তিনি যেখানেই গেছেন, তার ভালো লাগলে সেখানেই কোনো না কোনো প্যালেস ও সৌধ তৈরি করেছেন। কলকাতায় তার তৈরি নিজাম প্যালেস ও অনেক মসজিদ আছে। এই শহরটি আগে অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে তেলেঙ্গানা রাজ্যের অন্তর্গত রাজধানী শহর এই হায়দ্রাবাদ। ২০১৪ সালে ২ জুন তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরি হয়। মাত্র এই কয় বছরে ছবির মতো সাজানো এই হায়দ্রাবাদ শহর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যানবাহন চলাচলে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা ভীষণভাবে বাধ্য। ওখানে কৃষকের ঘরে আলো জ্বালাতে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না। প্রত্যন্ত গ্রামেও আলো ও জলের ব্যবস্থা আছে। ওখানে দরিদ্র দলিত শ্রেণীর মানুষদের দশ লক্ষ টাকা বিনা শর্তে প্রদান করে তাদের গ্রাম বাসযোগ্য করে নিজেরা যাতে কিছু উপার্জন করে জীবন ধারণ করতে পারে সরকার থেকে তার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। চিকিৎসা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাও সাধারণের জন্য ও বিত্তশালীর জন্য সুব্যবস্থা আছে। জিনিসপত্রের ও খাবার জিনিসের দাম একটু বেশি থাকলেও মানুষের ক্রমক্ষমতা এখনোও আছে। চারিদিকে মল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ছড়াছড়ি।

তবে কলকাতার মতো যেখানে-সেখানে ফুটপাথে দোকান-বাজার নেই। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোলেই যে সুদৃশ্য রাস্তাটি মনে ধরে রাখার মতো সুন্দর। তবে এখন পাহাড় কেটে, জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাসন বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেছে। কাজেই এই সৌন্দর্যায়ন কতদিন স্থায়ী থাকবে তা বোঝা খুবই শক্ত।

এবার একটু আমাদের ভ্রমণের কথা লিখি। বিশ্রামে থেকে ভালোমতো মানসিক আনন্দ পেয়ে মনে ও দেহে যেন একটু বল ফিরে পেয়েছি। ঠিক তখন ওরা ঠিক করলেন আমাদের নিয়ে তিরিলা বীচে যাবে। ওখানে সমুদ্রের কিছুটা দূরে দূরেই বিভিন্ন নামে সৈকত আছে এবং প্রত্যেকটা ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিরাজমান। যাক আমরা সকলে মিলে প্রথমে শ্রীলঙ্কা বীচে সমুদ্রের একদম কাছে সুইটে উঠলাম। পুরো চত্বরটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভিতরে গাড়ি পার্কিং এর আলাদা জায়গা নির্দিষ্ট আছে। তারপর রাস্তা বাঁধানো চোখ ধাঁধানো সুন্দর ফুলের বাগান। সেখানে বাইরের কেউই প্রবেশ করতে পারে না। এমন সুদৃশ্য ফুলের বাগান যে ভারতের প্রায় সবরকম ফুলের গাছই এখানে আছে। আর আছে নানা রকমের ফলগাছ। যেমন নারকেলগাছ, সুপারিগাছ, সবেদাগাছ, পেয়ারাগাছ, আমগাছ, বাতাবিলেবু, পাতিলেবু, কুলগাছ। আমাদের ঘরের সামনেই ছিল পেয়ারাগাছ, কুলগাছ, সবেদাগাছ। তবে লালমুখো বাদরের উৎপাত ছিল যথেষ্ট। ঘরে জানলার সামনে কোনোকিছু রাখার উপায় ছিল না। সব তুলে নিয়ে যেত।

আমাদের বাড়িটার কাছেই ছিল ওখানকার বিখ্যাত রেস্তুরেন্ট। ফোন করে জানিয়ে দিলেই ঘরে বসেই সবরকম খাবারসহ কফি ও চা পাওয়া যেত। দোতলার ব্যালকনিতে বসে আমরা জলখাবার খেতে খেতে সমুদ্রের ঢেউ ও সূর্যের নানারকম বিচ্ছুরণ দেখছি— এমন সময় সেই পরমবন্ধু এক লাফে এসে প্লেট থেকে খাবার তুলে নিয়ে সোজা আমগাছের মগডালে উঠে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেতে লাগলো। আমরা মজা করে ওই দৃশ্য দেখতে লাগলাম। শুধু কী তাই! একসঙ্গে থাকা ওই গাছের ঝোপে ও পাশের বাউন্ডারি দেওয়া ফাঁকা জমির গাছে অসংখ্য পাখির ডাকে ভোরবেলা ঘুম ভাঙতো আর সারাদিন এগাছে ওগাছে লাফিয়ে বেড়াতো পাখিগুলি। শালিক, বুলবুলি, টুনটুনি, ফিঙে, টিয়া, একরকম কালো-সাদা রঙের পাখিও দেখা যেত। ওগুলি সামুদ্রিক পাখি। মাঝে মধ্যে কোকিলের গান শুনতাম। সমুদ্রের তীর ছিল খুবই কাছে। শুধুমাত্র একটা দেওয়াল পেরোলেই সাদা বালিযুক্ত সমুদ্রসৈকত। সেখানে সারাদিন মাছ ধরে ব্যস্ত জেলেরা। অদূরেই ছিল জেলেপাড়া। সেখানে কোনো ছোট ছেলেমেয়েকে মাছ ধরতে দেওয়া হয় না। সৈকতে প্রচুর লাল কাঁকড়া ছিল। কিনুক, শামুক, নুড়িপাথর সংগ্রহ করার কোনো পেশাদারী লোক ছিল না। কাজেই পর্যটকরা তাদের ইচ্ছামতো কুড়িয়ে নিতে পারছে। প্রশাসনের তরফ থেকে লাগানো ছিল বোর্ড-পরিচ্ছন্নতা ও নীরবতা পালনের। সেখানে আমরা তিনদিন ছিলাম। অত্যন্ত মনোরম সমুদ্রসৈকত। ওখানে যাবার পথে দেখতে দেখতে গিয়েছিলাম চওড়া রাস্তা, দুদিকে পাহাড়, রাস্তার দুধানে যতদূর চোখ যায় তার আসপাশ দিয়ে রঙবাহারি পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। ফেরার পথে একই পথ দিয়ে আসার সময় ইউটার্ন নিয়ে আমরা চলে এলাম শ্রীরাম সৈকতে। রাস্তার মোড়েই রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের বিশাল মূর্তি। তার পাশ দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেই রাস্তা থেকেই সৈকত দেখা যাচ্ছে। খুব সুন্দর এখানে সমুদ্রের জল। অনেকটা সবুজ। শান্ত সমুদ্রে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষজন স্নান করছে। সামুদ্রিক পাখিরা অনুবর্ত মাছ ধরে উড়ে যাচ্ছে। আর পাড়ের ধারে ধারাবাহিকভাবে ঝাউবন থাকায় সৈকতকে মোহময়ী করে তুলেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই

সামনে রয়েছে এক বিরাট রিসর্ট। অনেকটা জায়গা নিয়ে ঘেরা। কিন্তু থাকার জায়গাসহ দর্শনীয় জিনিস রয়েছে প্রচুর। তবে গেট থেকে অনুমতি নিয়ে দর্শকদের প্রবেশ করতে দেয় এবং ওয়াশরুমও ব্যবহার করতে দেয়। ভেতরে মিউজিয়াম, ওখানকার তাঁতশিল্প, চা-কফি খাবার রেস্টুরেন্ট, এছাড়া নানারকমের সৌন্দর্যবর্ধক গাছগাছালি ও বিশাল সবুজ ঘাসের কার্পেটে মোড়া পার্ক। তোতে দোলনা, স্লিপ ও বসার জায়গা। সেখান থেকে খানিকটা এগিয়ে এসে একটু ঘুরে সোজা এগিয়ে এলেই তিরালা বীচ। সেটাও এমন নির্জন বীচ। খুবই সুন্দর। ওখানে সোজা গাড়ি চালিয়ে ভাইজাগ চলে যাওয়া যায়। এখানকার প্রত্যেকটা বীচেই প্লাস্টিক বর্জন ও অন্যান্য নিয়মকানুনগুলি খুবই যত্নসহকারে পালন করা হয়। নইলে প্রচুর টাকা জরিমানা দিতে হয়। এই ভ্রমণ কেন্দ্রে যাওয়া-আসার পথে কোথাও সুলভ কমপ্লেক্স নেই। কারণ প্রত্যেকটি পেট্রোল পাম্প, বুথে স্নানাগার ও টয়লেট রাখা বাধ্যতামূলক। তাই রাস্তায় যত্রতত্র কোথাও ময়লা পড়ে নেই। হায়দ্রাবাদে প্রতিদিন ময়লার গাড়ি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে লোক দিয়ে প্রত্যেক বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়, সেই ওদের নির্দিষ্ট ডাম্পিং স্টেশনে ময়লা ফেলে আসে। ওগুলো থেকেই ওরা জৈবসার ও বায়োগ্যাস তৈরি করেছে। এর আগেও আমরা দুবার হায়দ্রাবাদ বেড়াতে এসেছিলাম। কিন্তু এবার সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি। ২০২২ সালেই দেখে এসেছিলাম ১২৫ ফুট উচ্চ ড. আশ্বদকরের মূর্তি স্থাপিত হয়েছি। এটা তাঁর জন্মভূমি। এছাড়া তার পাশেই সরকারি অফিস সেক্রেটারিয়েট ভবন নির্মিত হয়েছে। বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকটা তাজমহলের আদলে। এছাড়া এখানকার ফিল্ম সিটি তো জগৎ বিখ্যাত। আপনি যে চরিত্রে সাজতে চাইবেন ওরা আপনাকে সেভাবেই সাজিয়ে ফোটো তুলে দেবে। দক্ষিণ ভারত এমনিতে মন্দিরের জন্যই খ্যাত। এখানে বালাজি মন্দির, জগন্নাথের মন্দির, শীসাইলা (দ্বাদশ সম্বলিসের মন্দির), অনুকুল ঠাকুরের, লোকনাথ বাবার মন্দির, সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের আদলে তৈরি কালীমন্দির। প্রত্যেকটি পাহাড়ের গায়ে অথবা সুদৃশ্য কোনো জায়গায় অবস্থিত। এছাড়া রয়েছে ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ আশ্রম, বাঙালি এ্যাসোসিয়েশন প্রায় প্রত্যেকটা পাড়ায় আছে। এখানকার শহরগুলি হাইটেক সিটি, স্মার্ট সিটি, টেকনোসিটি, বানজারা হিলস্ নামে খ্যাত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে টেকনোলজি, ও আইটির প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। এখানে একটু মফস্বল এরিয়ায় গ্রাম্য পরিবেশে হোম স্টের ব্যবস্থা করে পুকুর বা নাদীর মাছ ও ক্ষেত্রে সবজি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ণে ব্রতী হয়েছেন বেশ কয়েকটি পরিবার। এককথায় বলা যেতে পারে শান্তিপূর্ণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এই শহর মনকে আকর্ষণ করে বারে বারে।

বিশুদ্ধ জলই সঠিক পানীয়

ডা. গোবিন্দ মাইতি

আমরা যদি সঠিক মাত্রায় নিয়মিত জলপান করি তাহলে আমরা অনেক রোগকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবো। নিয়মিত জলপান শরীরে এক মহৌষধের কাজ করে। Medical Science-এ Hydropathyর

উপর বিশেষ চর্চা হচ্ছে এবং সঠিক পরিমাণ জলপান শরীরকে সুস্থ রাখার একটি সহজ পন্থা। শরীরে 70% জলের পরিমাণ। রক্তের মধ্যে ও বিভিন্ন কোষের মধ্যে জলের উপস্থিতি রয়েছে। তাই শরীরে জলের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খাদ্য হজম প্রক্রিয়ার সময় অনেক প্রকার Enzyme তৈরি হয়। জলপানে সেগুলো অনেকটা লঘু হয়ে যায়। বিশেষ করে fat জাতীয় খাদ্য হজমে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তাই খাওয়ার সঙ্গে জলপান করা অনুচিত। প্রয়োজনে অল্প জলপান বিধেয়। আমাদের প্রত্যেকদিন 3-4 L জলপান করা বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য Liver এর সমস্যা বা অন্য কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ডাক্তারের নিবেদন থাকলে সেটা মানতে হবে। বিশুদ্ধ জলপান করতে হবে। সেজন্য Aquaguard অথবা Filter এর সাহায্য নিতে হবে। ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল বা অন্য কোনো পানীয় শরীরের পক্ষে ক্ষতি করে। সাধারণ তাপমাত্রায় জলপান বিধেয়। শরীরের তাপমাত্রায় ভারসাম্য বজায় থাকে। সকালে খালি পেটে ঈষৎ উষ্ণ জল (২-৩ গ্লাস) পান করা বেশি উপকারী। সম্ভব হলে ১ চামচ মধু ও পাতিলেবুর রস সহ পান করলে আরও ভালো, বিশেষ করে যাদের সর্দি-কাশির ও কফের ধাত রয়েছে তাদের জন্য ঔষধের কাজ করবে।

সকালে ২-৪ গ্লাস জলপান করা যেতে পারে বিশেষ করে যারা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছে। আসলে constipation এর একটা বড় কারণ হলো জলপানের ঘাটতি। বিশেষ করে গরমকালে ঘামের ফলে দেহ থেকে জল অনেকটাই বেরিয়ে যায়। সকালে খালি পেটে জলপানের অভ্যাস জলের ঘাটতি দূর করে। মল নরম থাকে। Constipation এর সমস্যার অনেকটাই লাঘব হয়। সকালে ঘুম থেকে ওটার পর বাচ্চাদেরও প্রয়োজন মতো জলপান করতে হবে।

খাদ্য পরিবাকতন্ত্রে একাধিক এনজাইমের মূল উপাদান হলো জল। সকালে ঠিকমতো জলপানে এনজাইমগুলির উৎপাদন ও ক্ষরণে সহায়তা মেলে। সঠিকমাত্রায় জলপানে শরীরের বিপাকক্রিয়া ঠিক থাকে। খাদ্য হজমেও কোনো সমস্যা হবে না, শরীরের বর্জ্যপদার্থগুলি ঘাম ও ইউরিনের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। সঠিকভাবে জলপান করলে রেচনক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে হয়। ফলে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে ও ত্বকের উজ্জ্বলতাও বাড়ে। রক্তে Sodium/Potassium level ঠিক রাখতে জল খুব সাহায্য করে। জলপানের সঠিক অভ্যাস ক্ষুধা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। কিডনিতে পাথর তৈরি হলে জলপানে অনেকসময় ছোট ছোট পাথরগুলি বেরিয়ে যেতে পারে। এছাড়া মূত্রথলিতে পাথর থাকতে পারে। সেক্ষেত্রেও জলপান উপকারী।

অনেকের ধারণা সকালে ২ গ্লাস গরম জল খেলে শরীরের ওজন কমে। আদতে গরম জলের সঙ্গে ওজনের সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে খাবার হজম করার ক্ষেত্রে গরমজল খুব উপকারী। তাই দিনের শুরুতে গরমজল পান করলে শরীরে বিপাকক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। সঠিক পরিমাণ জলপান করা প্রয়োজন, আপনি যদি সঠিকভাবে হাইড্রেটেড না হন, তবে অবশ্য আপনার ঘূমের চক্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সঠিক জলপান সুনিদ্রা হতে সাহায্য করে।

কতকগুলি নিয়ম মেনে জলপান করলে সবকিছু শরীরকে ঠিক রাখতে পারে— ১) জলপান ধীরে ধীরে করতে হবে। চেয়ারে বসে পান করা বিধেয়, যাতে শরীরের তরল পদার্থের সামান্য বজায় থাকে।

২) Lunch বা Dinner এর ১ ঘণ্টা আগে বা পরে জলপান করা ভালো। Lunch এর পরে খাদ্যসামগ্রী

Stomach-এ digestion ক্রিয়া চলে তখন পাকস্থলির acid মাত্রা ঠিক থাকা দরকার তাহলে খাদ্য সহজে হজম হতে পারে। কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। জলপানে acid এর মাত্রা কমে যায়। তাই খাদ্য হজমের জন্য কিছু সময় দিতে হবে। প্রয়োজনে অল্প পরিমাম জলপান করা যেতে পারে।

৩) চা বা দুধ আরও দুটি পানীয় আমরা ব্যবহার করি। তবে বেশি গরম চা বা দুধ পান করা অনুচিত। তাতে শরীরের তাপমাত্রা বিঘ্নিত হয়। সেরকম ঠাণ্ডা জল পান করার ফলে Stomach এর তাপমাত্রার ভারসাম্য নষ্ট হয়। Stomach এর তাপমাত্রা বাড়াতে Energyর প্রয়োজন হয়। তখন শরীরের অন্যান্য metabolism প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। অন্যান্য বাজারজাত ঠাণ্ডা পানীয় শরীরের পক্ষে উপকারী নয়, পরিহার করাই শ্রেয়। সাময়িক আরাম লাগলেও এতে অনেক ক্ষতিকারক কেমিক্যালস থাকে। এনিয়ে প্রায় আলোচনা চলে। কিন্তু আমরা ক্ষতির দিকটা ভুলে সাময়িক আরামের জন্য পান করে থাকি। এগুলো কোনো food value নেই এমনকি রাস্তাঘাটে নিষ্পানি ও নানা ধরনের রঙিন সরবৎ আমরা খেয়ে থাকি, এগুলো বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করে না। বরফের মানও ভালো থাকে না। কোনো স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় না। নানাবিধ রোগ জীবাণু দেহে অনুপ্রবেশ ঘটে, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। গরমে ডাবের জল একটি বিশুদ্ধ পানীয়।

শরীর ঠিক রাখতে প্রত্যেকদিন সঠিকমাত্রায় জলপান করুন। তবে সবকিছুরই অতিরিক্ত ব্যাপার রয়েছে। খুব বেশি জলপানে শরীরের সোডিয়াম মাত্রা কমে যেতে পারে সেটা কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তবে প্রত্যেক দিন 3-4 L জল শরীরের কোনো ক্ষতি করে না। কিছুটা অতিরিক্ত জল ইউরিনের সাথে বেরিয়ে যায়। কিডনির সমস্যা যাদের আছে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ মেনে জলপান প্রয়োজন। রাত্রে Dinner এর পরে বেশি জল খাওয়া অনুচিত। কিডনির উপর চাপ পড়ে।

হাঁটা বা exercise এর 15-20 মিনিট বাদে জল খেতে হবে।

খুব ঝাল লাগলে আমরা অনেকটা জল খেয়ে নিই। কিন্তু পরিবর্তে অল্প একটু মধু অথবা একটি মিষ্টি খেলে সমস্যার সহজ সমাধান হবে।

নাস্তিকতাই সত্যি

তপন কুমার দাস

চার্বাকের জন্য স্বর্গ নাই। তাঁর জন্মান্তর নাই। বিচারের জন্য কোথাও অপেক্ষা করা নাই। কারও স্বপ্নে তিনি দেখা দেন না। আকাশের কোণে কখনও আবছা আলোয় ফুটে ওঠে না। তাঁর মৃত্যুর পর ভস্মীভূত দেহের আর পুনরাগম হয় না। তাঁর লিখিত গ্রন্থ ভবিষ্যতের মানুষের পড়ার জন্য উপস্থিত করা হয়নি। কিন্তু চার্বাক আছে। এই আক্রমণ ক্রমাগত বাড়ছে।

বাস্তবত, পৃথিবীজুড়ে নাস্তিকেরা আক্রান্ত। বিশ্বমানব মহাবিশ্বে পা রাখলেও মুক্তচোখে মহাবিশ্বকে আমরা দেখাতে পারলাম না। আবার আক্রমণের চরিত্র দিন দিন বাড়ছে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে। তার সদ্য

প্রমাণ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে। ধর্ম আছে, কিন্তু বেঁচে থাকার ঠিকানা নেই।

সেই প্রাচীন যুগে আদিম অশিক্ষিত মানুষ অশক্ত মানুষ, অসহায় মানুষ যে অজ্ঞানতার মাঝে দাঁড়িয়ে অলৌকিক কল্পনার পথে হেঁটেছিল সেই যাত্রার বহমান নাম হল ধর্ম। কী এক বিচিত্র মানসিকতায় ধর্ম নামক নিছক কল্পনার রথ আজও মানুষ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাতে হয়তো তেমন কিছু ক্ষতি হত না, যদি শিশু যেমন কল্পনা মন নিয়ে চলতে চলতেই বাস্তব জীবনের সত্যের দিকে অগ্রসর হয়, ধর্ম যদি তেমনি সত্যের পথে অগ্রসর হত— অন্তত তেমন হলেই শিশুরা বাস্তববাদী হত। কিন্তু ধর্ম যেহেতু জানে যে জ্ঞানের বিকাশ হলে, সত্যের চর্চা হলে, ধর্ম নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ-আলোচনা-সমালোচনা হলে এই মনগড়া কল্পনাস্বর্গ ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। তাই সবসময় ধর্ম আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক— সে সর্বদা এক অলিখিত জরুরি অবস্থা বজায় রেখে মানুষকে শাসন করে।

বিজ্ঞানের বিকাশের পদে পদে খ্রিস্টান ধর্ম আঘাত করেছে। কার্যত সে দিন যদি ধর্মনিরপেক্ষতার ধাক্কায় রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থেকে ধর্ম বিচ্ছিন্ন না হত তা হলে বিজ্ঞানের বিকাশই রুদ্ধ হয়ে থাকত। মধ্যযুগে ইসলামের জ্ঞানচর্চার আলো কটুর ধর্ম নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ হয়ে গিয়ে চিররুদ্ধ হয়ে গেল। বর্তমানে বিশ্বে সেই কারণে নাস্তিকতা সবথেকে বেশি ভয়ঙ্করভাবে ইসলামের কাছে আক্রান্ত। বলা বাহুল্য, তার মধ্যে সবথেকে বেশি আক্রান্ত মুসলিম দেশে।

আন্তর্জাতিক হিউম্যানিষ্ট ও এথিক্যাল ইউনিয়ন একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা গ্রহণ করে। তারা নানা দেশের যেসব ঘটনা জানতে পারে— সরকার ও নানা ধর্মীয় সংস্থার আচরণ, ফতোয়া, হামলা, হুমকি এমনকি হত্যাকাণ্ড— তার ভিত্তিতে সমীক্ষা রচনা করে। সমীক্ষাটি ইউরোপীয় সংসদে পেশ করা হয়। তা থেকে জানা যায় যে, সারা বিশ্বে ৮৫টি দেশে নাস্তিকরা নিরাপদ নয়। নানা ঘটনায় বারবার উঠে এসেছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সৌদি আরব, মালেশিয়া, সুদান, মালদ্বীপ, মিশর, কাতার, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান ও ভারত— অর্থাৎ মুসলমান দেশ, যার মধ্যে ভারতে মুসলমান একটা বিরাট অংশ। পৃথিবীতে ৩০টি দেশে নাস্তিকতা ভয়ানকভাবে আক্রান্ত। শুনলে অবাক লাগবে— ৩০টি দেশের মধ্যে বিশেষভাবে বিপদজনক বাংলাদেশ।

শান্তির ধর্ম বলে আপ্তবাক্যের মতো উল্লিখিত হলেও ইসলাম ধর্মই সবথেকে অসহিষ্ণুভাবে নাস্তিকদের জীবন বিপন্ন করে তুলছে। আর একাজে অনেক রাষ্ট্রই নানা আইন, নিষেধাজ্ঞার বর্মধারীদের প্রশ্রয় দেবার নামে এই কাজে উৎসাহ দিচ্ছে। ইসলাম ধর্ম এমন মধ্যযুগীয় আক্রমণাত্মক কাজ আজও বহন করে চলেছে তার একটি কারণ হল, রাষ্ট্রীয় নিয়মকানূনের সর্বজনীন প্রয়োগ না করে মোল্লা মৌলবী ইমাম খোমেনী জাতীয় ধর্মীয় প্রতিনিধিদের উপর এখনও জীবনযাপনকে নির্ভরশীল করে রাখে। তারা আধুনিক জ্ঞানের থেকে শত যোজন দূরে অবস্থান করে সেই মান্ধাতার ধর্মীয় নিয়মকে অনুসরণ করে মানুষকে ফতোয়াবদ্ধ করে চলেছে। আর এই চেতনাই সর্বসাধারণে বাহিত হয়ে চলেছে।

এই চেতনায় যুক্তরাষ্ট্রেও একজাতীয় ধার্মিক বাইবেল— বিরোধীদের নাস্তিকবোধে ঘৃণা ও নির্যাতন করে থাকে। কিন্তু একদিন ধর্মমুক্ত পৃথিবীই দেখা যাবে, পৃথিবী নাস্তিকশূন্য করা যাবে না। কারণ বিশ্বজনসংখ্যায় নাস্তিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে চলেছে ক্রমাগত হারে। বিজ্ঞান চেতনার ফসল আমরা পাব এটাই আমাদের ভবিষ্যত। আসুন সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাই।

সওয়াল জবাব

মৃণাল দত্ত

আচ্ছা বাবা বলো দেখি
টিকিটকিরা কোথা থেকে জল খায়?
সেকি! জানানো টুকাই
টিকিটকিরা দেয়াল চেটে তেষ্ঠা মেটায়
বর্ষাকালে দেওয়ালগুলো ভিজ়ে যায়
সারা বছর ওদের জন্য জল রেখে যায়।
আচ্ছা বাবা এ্যাতো ছোট
এত দম কোথায় পায়?
আরে ঘোড়া হলো টিকিটকিদের মামা
তাইতো ওরা মামার মতো কেবলি ধায়।
তাই যদি হয় বাবা
ঘোড়ারা সব কত বড়, ওরা কেমন ছোটো।
এসব হলো বিবর্তনের ফল
জগৎজোড়া সকল প্রাণীই বড় এবং ছোট
হাতির দ্যাখো বিশাল আকার
দুলিয়ে থাকে কুলোর মতো কান
পিঁপড়ে আবার এ্যাতো ছোট
দেখা যায় না প্রায়, কামড়ে তার বিষের বাণ
সব কিছুই কারণ থাকে
প্রকৃতি দেয় সবার স্বাস
নীল আকাশে সাদা মেঘ কালো মেঘ
কেবলি ছোটো, পিছনে তার বইছে বাতাস।



জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র



বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা
১০টাকা (প্রতিবার)

- ১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক)
২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধ্যা ৬টা
- ২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল
অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা
- ৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল
মেডিসিন) বিকেল ৫টা
- ৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও
(গাইনোকলজিস্ট) সন্ধ্যা ৭টা
- ৫) ডঃ সৌম্য চাটার্জী - এম.ডি. (নিউরো-সাইকিয়া-
ট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টা
- ৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল
কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা
- ৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট)
সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধ্যা ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা)
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪